দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...18. JAN. 2015.........
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৩......

কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে

ফাহমিদা আহমদ

একের পর এক পাবলিক পরীক্ষা। পরীক্ষার জালে আটকা পড়েছে শিক্ষার্থীরা। দিশেহারা অভিভাবক। ব্যস্ততার শেষ নেই স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষেরও। যাদের দু' তিনটি ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে, পাবলিক পরীক্ষার চাপে তাদের অবস্থা শোচনীয়। একজনের পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই আরেকজনের শুরু। সন্তানের পেছনে সময় দিতেই তাদের জীবন পার। ঘর-সংসার, ধর্ম-কর্ম, সামাজিকতা কোন কিছুতেই মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। ঘন ঘন পাবলিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে চলছে জমজমাট কোচিং-প্রাইভেট-মডেল টেস্ট প্রভৃতি চটকদার নামে কোচিং বাণিজ্য। বছরে চারটি পাবলিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে চলছে নানামুখী অসুস্থ প্রতিযোগিতা। মা-বাবা পাগলের মতো ছুটছে সন্তানের জিপিএ ৫, গোল্ডেন জিপিএ ৫ নিশ্চিত করার জন্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটছে কে কার আগে যাবে সে প্রতিযোগিতার পেছনে। এসবের শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। নতুন শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই কোচিংয়ে নেমে পড়েছেন তারা। স্কুলে ক্লাসের সাথে পাল্লা দিয়েই চলছে এসব কোচিং। শিক্ষার্থী আকর্ষণে কোচিংবাজ শিক্ষকরা নানা ফাঁদ পেতে বসেছেন। এর বাইরে স্কুল কোচিংও থেমে নেই। রাজধানীর সবকটি স্কুলেই পঞ্চম ও অষ্টম এবং নবম-দশম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর কোচিং বাধ্যতামূলক করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এর জন্য বাড়তি ফিও দিতে হচ্ছে নতুন বছরে নতুন ক্লাসে ভর্তির সময়েই। অন্যদিকে কোচিং সেন্টারগুলোও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট কোচিং কিংবা এসএসসি প্রস্তুতি কোচিং এবং ছাড়ে ভর্তির মতো আকর্ষণীয় অফার সম্বলিত লেখা ব্যানার ও পোস্টার ছড়িয়ে দিচ্ছে রাজধানীসহ সারাদেশের শহরগুলোতে। নোট, সাজেশন আর নিয়মিত পরীক্ষার নামে হাতিয়ে নিচ্ছে কাড়ি কাড়ি টাকা। ভালো ফল এবং কোচিংয়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখাতে প্রশ্নফাঁসের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে অনেক কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। শিক্ষার্থীরা ভালো ফলের আশায় ছুটছে এসবের দিকে। নিশ্চিত জিপিএ ৫, শতভাগ পাসের নিশ্চয়তার মতো চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আকৃষ্ট করছে কোচিং সেন্টারগুলো। শিক্ষার্থীর মেধা থাকুক কিংবা নাই থাকুক এ নিয়ে কেউ বিচলিত নয়। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোচিংয়ে পড়লেই পরীক্ষায় পাস কিংবা জিপিএ ৫ পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের নামে এটি এখন পরিণত হয়েছে চাতুরী ব্যবসায়। লাভজনক এই ব্যবসার কারণে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন নামে শত শত কোচিং সেন্টার। শহর এলাকার বিভিন্ন অলি-গলিতে ছোট ছোট ভাড়া বাসা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে কোচিং সেন্টার। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কোচিংগুলোতে ভর্তি হতে হচ্ছে তাদের। কোচিং সেন্টারগুলোতে সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। একদিকে স্কুলের পড়ার চাপ, তার উপর কোচিংয়ের প্রতিদিনের পড়ার চাপ; এতে করে মানসিক, শরীরিক দু'ভাবেই ভেঙে পড়ছে শিক্ষার্থীরা।

দেশের শত শত সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষক নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে স্কুলে স্কুলে কোচিং রাজত্ব কায়েম করেছেন। শিক্ষকদের কেউ কেউ শিক্ষার্থীদের ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্যে ফেল করানোর ভয় দেখিয়ে নিজের কাছে পড়তে বাধ্য করছেন। আবার কেউ ক্লাসে দাঁড় করিয়ে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে ও ভাষায় অপমান-অপদস্ত করে তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন।

> *কোচিং বাণিজ্য রোধে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ সব মহলকে সচেতন হতে হবে। আইন করে এটা রোধ করা যাবে না। কোচিংয়ের নেতিবাচক দিকগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। তাহলে অনেকেই সচেতন হবে। শিক্ষকদের নৈতিক দিক থেকে আরো বেশি শক্তিশালী হতে হবে এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ব্যাপারে আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে। কোচিং বাণিজ্যির সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ এসেছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য যে মনিটরিং কমিটি গঠন হয়েছিল সেটিও বাস্তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে মনিটরিং কমিটি লোক দেখানো ও আইওয়াশ বলে অনেকেই মনে করেন।*

এভাবেই অনৈতিক দুষ্টবুদ্ধির শিক্ষকদের আর্থিকভাবে খুশী করতে শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে ভিড়ছেন। সারাদেশে অবৈধ কোচিং বাণিজ্য এখন তুঙ্গে। প্রতিবছর দেশজুড়ে কমপক্ষে ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং বাণিজ্য চলছে। শিক্ষার জন্য বছরে এ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে অভিভাবকদের। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে কোচিং সেন্টারগুলো। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। বহু ক্ষেত্রেই নিম্নমানের শিক্ষকরা পাঠদান করছেন। রাজধানীকেন্দ্রিক গড়ে উঠা বৃহৎ কোচিং সেন্টারগুলো ঢাকার বাইরে একের পর এক শাখা খুলছে। কোচিং বাণিজ্য কার্যত নিষিদ্ধ হলেও এসব প্রতিষ্ঠান জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে ব্যবসার জন্য নিবন্ধন গ্রহণ করে কোচিং ব্যবসা চালাচ্ছে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম এখন আর স্কুলের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষার্থীর হাজিরা নেয়া এবং পরীক্ষার আয়োজন করা ছাড়া স্কুল শিক্ষকদের যেন আর কোন কাজ নেই। স্কুল প্রধান ব্যস্ত থাকেন স্কুলে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে। শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিং সেন্টার নিয়ে। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকলেও পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয় না বা জরিমানা করা হয়। এ কারণে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকে বেশি। এর বাইরে সকাল-সন্ধ্যা শিক্ষকের বাসায় এবং কোচিং সেন্টারে গিয়ে সময় কাটাতে হচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে কর্মপরিকল্পনা এবং কোন জবাবদিহিতা না থাকায় এমনটি হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোচিংয়ের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে যাতে তাদের উপর কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। শিক্ষার্থীদের বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে যেতে হয়। কিন্তু এটি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি। সব পরিবারের শিক্ষার্থীর প্রাইভেট পড়ানোর সামর্থ্য নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ক্লাসে না যতটা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকে কোচিং সেন্টারে বা কোন স্কুল শিক্ষকের বাসায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকে অনেক বেশি। যেসব শিক্ষার্থীর শিক্ষকের কাছে গিয়ে বা কোচিং সেন্টারে পড়ার সামর্থ আছে তারাই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করছে। যাদের সামর্থ নেই তারা পরীক্ষায় খারাপ করছে। গ্রামাঞ্চলে কোচিং সেন্টার চালু না হলেও মফস্বল শহর এবং রাজধানীর অলিগলিতে গজিয়ে উঠছে কোচিং বাণিজ্য। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কোচিং এবং প্রাইভেট টিউশনের মধ্যে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৮০ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া ১৮ হাজার ৫শ' মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২ লাখ ৪০ হাজার, ৩ হাজার ১৫০টি কলেজে ৯০ হাজার ৫শ', ৯ হাজার ২শ' মাদ্রাসায় ১ লাখ ৫২ হাজার শিক্ষক কর্মরত আছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্কুল-কলেজে ৭ লাখ শিক্ষক কর্মরত থাকলেও শিক্ষার্থীদের স্কুলসময়ের বাইরে কোচিং এবং প্রাইভেট টিউটরের কাছে যেতে হবে কেন? সরকারি শিক্ষক ছাড়াও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা বেতনের শতভাগ পেয়ে থাকেন। সরাসরি বেতন গ্রহণ করার পরও তারা স্কুলে পাঠদানে ততটা মনোযোগী নন। বেশিরভাগ শিক্ষকই স্কুলের চেয়ে বাসায় বা কোচিং সেন্টারে পড়াতে আগ্রহী। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় বাদে সকল শিক্ষার্থীকেই কোন কোন শিক্ষকের বাসায় গিয়ে পড়তে হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধের নীতিমালা ২০১২ অনুযায়ী কোন শিক্ষক তার নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে পারবেন না। নীতিমালা অনুযায়ী, অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি লাগবে। কিন্তু কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই কোচিংবাজ শিক্ষকরা কোচিং চালিয়ে যাচ্ছেন। সেভ দ্যা চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় চাইল্ড পার্লামেন্টের জরিপে দেখা যায়, ৮২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী কোচিংয়ে অংশ নেয়। জরিপে বলা হয়, বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় গুণগত শিক্ষা দিতে পারছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলের জন্য গৃহশিক্ষক বা কোচিংয়ের শরণাপন্ন হচ্ছে। পরিবারের উপর কোচিং বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে এবং এ ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন।

কোচিং বাণিজ্য রোধে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ সব মহলকে সচেতন হতে হবে। আইন করে এটা রোধ করা যাবে না। কোচিংয়ের নেতিবাচক দিকগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। তাহলে অনেকেই সচেতন হবে। শিক্ষকদের নৈতিক দিক থেকে আরো বেশি শক্তিশালী হতে হবে এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ব্যাপারে আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে। কোচিং বাণিজ্যির সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ এসেছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য যে মনিটরিং কমিটি গঠন হয়েছিল সেটিও বাস্তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে মনিটরিং কমিটি লোক দেখানো ও আইওয়াশ বলে অনেকেই মনে করেন।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে এটি একটি- মূলে শিক্ষা। শিক্ষা উন্নতির প্রধান সোপান। শিক্ষার যে বাণিজ্যিকরণ হয়েছে তাতে অচিরেই আমরা একটি মেধাশূন্য জাতিতে পরিণত হব। সরকারকে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্তত শিক্ষা ক্ষেত্রে সব ধরনের দুর্নীতি বন্ধে বিশেষত কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান জোরদার ও কোচিং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নীতিমালা জারি করে সেটি বাস্তবায়ন করতে হবে। মনিটরিং সেল গঠন করে তার ফলোআপ করতে হবে। নিয়মভঙ্গকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শরীরিক, মানসিক অবস্থা এবং অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আনতে হবে।